পেয়ালা

(গল্পগ্রন্থ – যাত্রাবদল)

সামান্য জিনিস। আনা তিনেক দামের কলাই-করা চায়ের ডিস্-পেয়ালা।

যেদিন প্রথম আমাদের বাড়িতে ওটা ঢুকল, সেদিনেরকথা আমার বেশ মনে আছে। শীতকাল, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে লেপের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করচি, এমন সময় কাকার গলার সুর শুনে দালানের দিকে গেলাম। কাকা গিয়েছিলেন দোকান নিয়ে কুলবেড়ের মেলায়।নিশ্চয়ই ভালো বিক্রি-সিক্রি হয়েছে।

উঠোনে দু'খানা গরুর গাড়ি। কৃষাণ হরু মাইতি একটালেপ-তোশকের বান্ডিল নামাচ্চে। একটা নতুন ধামায়একরাশ সংসারের জিনিস—বেলুন, বেড়ি, খুন্তি, ঝাঁঝরি, হাতা। খানকতক নতুন মাদুর, গোটা দুই কাঁঠাল কাঠের নতুন জলচৌকি। এক বোঝা পালংশাকের গোড়া, দু-ভাঁড় খেজুরেগুড়, আরো সব কি কি।

কাকা আমায় দেখে বললেন—নিবু, একটা লণ্ঠন নিয়ে আয়—এটায় তেল নেই।

আমি এক দৌড়ে রান্নাঘরের লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে এলাম।পিসিমা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, কিন্তু তখন কে কথা শোনে ?

কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম—মেলায় এবার লোকজনকেমন হল কাকা ?

কাকা বললেন—লোকজন প্রথমটা মন্দ হয়নি, কিন্তু হঠাৎকলেরা শুরু হয়ে গেল, ওই তো হল মুশকিল ! সব পালাতেলাগল, বাঁওড়ের জলে রোজ পাঁচটা ছটা মড়া ফেল্ছিল, পুলিশ এসে বন্ধ করে দিলে, খাবারের যত দোকান ছিল সব উঠিয়ে দিলে, কিছুতেই কিছু হয় না, ক্রমে বেড়ে চলে। শেষে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম। বিক্রি-সিক্রি কাঁচকলা, এখন খোরাকি, গাড়িভাড়া উঠলে বেঁচে যাই।

খেতে বসে কাকা মেলার গল্প করছিলেন, বাড়ির সবাইসেখানে বসে। কি করে প্রথমে কলেরা আরম্ভ হল, কতলোক মারা গেল, এই সব কথা।

—আহা সাম্টা-মানপুর থেকে কে একজন, যদু চক্কোত্তিনা কি নাম—একখানা ছই-এর গাড়ি পুরে বাড়ির লোকনিয়ে এসেচে মেলা দেখতে। ছেলে-মেয়ে, বউ-ঝি, সেএকেবারে গাড়ি বোঝাই। বাঁওড়ের ধারের তালতলায় গাড়িরেখে সেখানেই সব রেঁধে খায়-দায়, থাকে। দু-দিন পরে রাত পোহালে বাড়ি ফিরবে, রাত্তিরেই ধরল তাদের একটান-বছরের মেয়েকে কলেরায়। কোথায় ডাক্তার, কোথায়ওষুধ, সকাল দশটায় সেটা গেল তো ধরল তার মাকে। রাতআটটায়মাগেল তো ধরল বড় ছেলের বউকে। তখনএদিকেও রোগ জেঁকে উঠেচে, কে কাকে দ্যাখে—তারপরসে যা কাণ্ড। এক-একটা করে মরে, আর পাশেই বাঁওড়ের জলে ফেলে—আদ্ধেক গাড়ি খালি হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের যাসর্বনাশ ঘটল আমাদের চোখের সামনে, উঃ !

কাকা ভুষিমালের ব্যবসা করেন। প্রায় চল্লিশ মণসোনামুগ মেলায় বিক্রির জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, মণ বারো নাতেরো কাটাতে পেরেছিলেন, বাকি গরুর গাড়িতে ফিরে আসচে, কাল সকাল নাগাদ পৌঁছুবে। গাড়িতে আছেআমাদের আড়তের সরকার হরিবিলাস মান্না।

কাকা খেয়ে উঠে যাবার একটু পরেই কাকার ছোট মেয়ে মনু একটা কলাই-করা পেয়ালা রান্নাঘরে নিয়ে এসে বল্লে, এই দ্যাখো জ্যাঠাইমা, বাবা এনেছেন, কাল আমি এতে চা খাব কিন্তু। হাতে তুলে সকলকে দেখিয়ে বল্লে—বেশ কেমন,না।মেলায় তিন আনা দরে কেনা—

এই প্রথম আমি দেখলুম পেয়ালাটা।

সে আজ চার বছরের কথা হবে।

তারপর বছর দুই কেটে গেল। আমি কাজ শিখে এখন টিউবওয়েলের ব্যবসা করি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ডেরকাজ সংগ্রহ করবার জন্যে এখানে-ওখানে বড় ছুটাছুটি করে বেড়াতে হয়। বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকা আজকাল আর বড়ঘটে না।

সেদিন সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতা আসব, আমারবিছানাপত্র বেঁধে রান্নাঘরে চায়ের জন্যে তাগাদা দিতেগিয়েচি—কানে গেল আমার বড় ভাইঝি বলচে—ও পেয়ালাটাতে দিয়ো না পিসিমা, বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও পেয়ালাটা দেখতে পারে না দু'চোখে—

আমি বল্লুম—কোন্পেয়ালাটা রে ?কি হয়েচেপেয়ালার ?

আমার ভাইঝি পেয়ালা নিয়ে এল, মনে হল কাকারকেনা অনেক দিনের সে পেয়ালাটা।

সে বল্লে—বউদিদির অসুখের সময় এই পেয়ালাটা করেদুধ খেতেন, তারপর বাবার সময়ও এতে করে ওঁর মুখেসাবু ঢেলে দেওয়া হত—মা বলে, আমি ওটা দেখতে পারিনে—

আমার এই জ্যাঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী কলকাতা থেকেআমাদের এখানে বেড়াতে এসে অসুখে পড়েন এবং তাতেইমারা যান। এর বছর দুই পরে কাকাও মারা যান পৃষ্ঠব্রণরোগে। কিন্তু এর সঙ্গে পেয়ালাটার সম্পর্ক কি ?যত সবমেয়েলী কুসংস্কার !

পরের বছর থেকে আমার টিউবওয়েলের কাজ খুবজেঁকে উঠল, জেলা বোর্ডের অনেক কাজ এল আমার হাতে। আমার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, দূর-দূরান্তেরপাড়াগাঁয়ের নানা স্থানে টিউবওয়েল বসানো ও মিস্ত্রিখাটানোর কাজে মহা ব্যস্ত—বাকি সময়টুকুযায়আর-বছরের বিলের টাকা আদায়ের তদ্বিরে।

সংসারেও আমাদের নানা গোলযোগ বেধে গেল। কাকা যত দিন ছিলেন কেউ কোনো কথাটি বলতে সাহস করেনি সংসারের পুরানো ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে। এখন সবাই হয়েদাঁড়াল কর্তা, কেউ কাউকে মেনে চলতে চায় না।

ঠিক এই সময় আমার ছোট ছেলের ভয়ানক অসুখ হল।আমার আবার সেই সময় কাজের ভিড় খুব বেশি। জেলাবোর্ডের কাজ শেষ হয়ে গিয়েচে, কিন্তু টাকার তাগাদাকরতে হবেঠিক এই সময়টাতে। নইলে বিল চাপা পড়তেপারে ছ-মাস বা সাত মাসের জন্যে। আমি আজ জেলা, কাল মহকুমা ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলুম,—এ-মেম্বারও-মেম্বারকেধরি, যাতে আমার বিলের পাওনাটা চুকিয়ে দিতে তাঁরা সাহায্য করেন।

কাজ মিটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন এদিকেও কাজমিটে গিয়েছে। ছেলেটি মারা গিয়েচে—অবিশ্যি চিকিৎসারত্রুটি হয়নি কিছু, এই যা সান্ত্বনা।

বছরের শেষে আমি শহরে বাসা করে স্ত্রী ওছেলে-মেয়েদের সেখানে নিয়ে এলাম। বাড়ির ওই সব দুর্ঘটনার পরে সেখানে আমাদের কারুর মন বসে না, তাছাড়া আমার ব্যবসা খুব জেঁকে উঠেচে—সর্বদা শহরে নাথাকলে কাজের ক্ষতি হয়।

টিউবওয়েলের ব্যবসাতে নেমে একটা জিনিস আমারচোখে পড়েচে যে, আমাদের দেশের, বিশেষ করেপাড়াগাঁয়ের লোকদের মতো অলসপ্রকৃতির জীব বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত অল্পে সন্তুষ্ট মানুষ যে কিকরে হতে পারে সে যাঁরা এদের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদেরধারণাতেও আসবে না। নিশ্চিত মৃত্যুকেও এরা পরমনিশ্চিন্তে বরণ করে নেবে, সকল রকম দুঃখ দারিদ্র্যঅসুবিধাকে সহ্য করবে কিন্তু তবু দু-পা এগিয়ে যদি এরকোনো প্রতিকার হয় তাতে রাজী হবে না। তবে ওদেরএকটা গুণ দেখেচি, কখনো অভিযোগ করে না এরা, দেশের বিরুদ্ধেও না, দৈবের বিরুদ্ধেও না।

বাইরে থেকে এদের দেখে যাঁরা বলবেন এরা মরে গিয়েচে, এরা জড় পদার্থমাত্র, ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলে কিন্তু তাঁরা মত বদলাতে বাধ্য হবেন। এরা মরেনি, বোধ হয় মরবেও না কোনো কালে। এদের জীবনীশক্তি এত অফুরন্ত যে, অহরহ মরণের সঙ্গে যুঝে এবং পদে পদে হেরে গিয়েও দমে যায় না এরা বা ভয় পায় না, প্রতিকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না। সহজভাবেই সব মেনে নেয়, সব ব্যবস্থা।

খারাপ বিলের পাটপচানো জল খেয়ে কলেরায় গ্রামউৎসন্ন হয়ে থাকে, তবু এরা টিউবওয়েলের জন্যে একখানাদরখাস্ত কখনো দেবে না বা তদ্বির করবে না। কে অতছুটোছুটি করে, কে-ই বা কষ্ট করে ?শুধু একখানা দরখাস্তকরা মাত্র, অনেক সময় দরকার বুঝলে জেলা বোর্ড থেকেবিনা খরচায় টিউবওয়েল বসিয়ে দেয়—কিন্তু ততটুকুহাঙ্গামাকরতেও এরা রাজি নয়।

বাসায় একদিন বিকেলে চা খাওয়ার সময়ে লক্ষ করলুম, আমার ছোট মেয়েটি সেই কলাই-করা পেয়ালাটা করে চাখাচ্ছে।

যদিও ওসব মানি নে, তবুও আমার কি-জানি-কি মনেরভাব হল—চা খাওয়া-টাওয়া শেষ হয়ে গেলে পেয়ালাটাচুপি চুপি বাইরে নিয়ে গিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুমপাঁচিলের ওধারের জঙ্গলের মধ্যে।

কাকার বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, ছোট মেয়েটির বয়স দশ বছর, খুব বুদ্ধিমতী। শহরের মেয়ে-স্কুলেলেখাপড়া শেখাব বলে ওকে বাসায় এনে রেখেছিলুম,স্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছিলুম।

মাস পাঁচ-ছয় কাটল। বৈশাখ মাস।

এই সময়েই আমার টিউবওয়েলের কাজের ধুম। আটদশ দিন একাদিক্রমে বাইরে কাটিয়ে বাসায় ফিরি কিন্তু তখনই আবার একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হয়। এতে পয়সারোজগার হয় বটে, কিন্তু স্বস্তি পাওয়া যায় না। স্ত্রীর হাতের সেবা পাই নে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পাই নে, শুধু টো টো করে দূরদূরান্তের চাষাগাঁ ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—শুধুই এস্টিমেট কষা, মিস্ত্রি খাটানো। মানুষ চায় দু-দণ্ড আরামেথাকতে, আপনার লোকেদের কাছে বসে তুচ্ছ বিষয়ে গল্পকরতে, নিজের সাজানো ঘরটিতে খানিকক্ষণ করে কাটাতে, হয়তো একটু বসে ভাবতে, হয়তো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু ছেলেমানুষি করতে—শুষ্ক টাকা রোজগারে এসবঅভাব তো পূর্ণ হয় না।

হঠাৎ চিঠি পেয়ে বাসায় ফিরলাম, কাকার ছোটমেয়েটির খুব অসুখ।

আমি পৌঁছলাম দুপুরে, একটু পরে রোগির ঘরে ঢুকেআমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলুম। আমার পিসিমা সেইকলাই-করা পেয়ালাটাতে রোগিকে সাবু না বার্লিখাওয়াচ্চেন।

আমি আমার মেয়েকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসাকরলুম—ও পেয়ালাটা কোথা থেকে এল রে ?খুকিবললে—ওটা কুকুরে না কিসে বনের মধ্যে নিয়ে ফেলেছিলবাবা, মনুদি দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছিল। সে তো অনেকদিনের কথা, পাঁচিলের বাইরে ওই যে বন, ওইখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি বিস্মিত সুরে জিজ্ঞেস করলুম—মনু নিয়ে এসেছিল ?জানিস্ ঠিকতুই ?

খুকি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ বাবা, আমি খুব জানি। তুমি না হয় মাকে জিজ্ঞেস করো; আমাদের সেই যে ছোকরা চাকরটাকে কুকুরে কামড়েছিলনা, ওই দিন সকালে মনুদি পেয়ালাটা কুড়িয়ে আনে। ওই পেয়ালাতে তাকে কিসের শেকড়ের পাঁচন খাওয়ানো হল, আমার মনে নেই !

আমি চমকে উঠলুম, বললুম—কাকে রে ?রামলগনকে ?

—হ্যাঁ বাবা, সেই যে তারপর এখান থেকে চলে গেলদেশে, সেই ছেলেটা।

আমার সারা গা ঝিমঝিম করছিল—রামলগনকে কুকুরেকামড়ানোর পর দেশে চলে গিয়েছিল—কিন্তু সেখানে যে সে মারা গিয়েছে এ খবর আমি কাউকে বলিনি। বিশেষ করে গৃহিণী তাকে খুব ভালোবাসতেন বলেই সংবাদটা আরবাসায় জানাইনি। আমাদের টিউবওয়েলের মিস্ত্রিশিউশরণের শালীর ছেলে সে—সেই খবরটা মাসখানেকআগে আমায় দেয়।

মনুর অসুখ তখনো পর্যন্ত খুব খারাপ ছিল না, ডাক্তারেরা বলছেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমারকিন্তু মনে হল ও বাঁচবে না।

ও পেয়ালাটার ইতিহাস এ বাসায় আর কেউ জানে না, অসুখের সময় যে ওতে করে কিছু খেয়েছে সে আরফেরেনি। জানত কেবল কাকার বড় মেয়ে, সে আছেশ্বশুড়বাড়ি।

পেয়ালাটা একটু পরেই আবার চুপি চুপি ফেলেদিলুম-হাত দিয়ে তোলবার সময় তার স্পর্শে আমার সারাদেহ শিউরে উঠল—পেয়ালাটা যেন জীবন্ত মনে হল, যেনএকটা ক্রূর, জীবন্ত বিষধর সাপের বাচ্চার গায়ে হাতদিয়েচি, যার স্পর্শে মৃত্যু..যার নিঃশ্বাসে মৃত্যু...

পরদিন দুপুর থেকে মনুর অসুখ বাঁকা পথ ধরল, ন'দিনের দিন মারা গেল।

আমি জানতুম ও মারা যাবে।

মনুর মৃত্যুর পর পেয়ালাটা আবার কুড়িয়ে এনে ব্যাগেরমধ্যে পুরে কাজে বেরুবার সময় নিয়ে গেলুম। সাত-আট ক্রোশ দূরে একটা নির্জন বিলের ধারে ফেলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

শোকের প্রথম ঝাপ্‌টা কেটে গিয়ে মাস দুই পরে বাসা একটু ঠান্ডা হয়েছে তখন। কথায় কথায় স্ত্রীর কাছে একদিনএমনি পেয়ালাটার কথা বলি। তিনি আমার গল্প শুনে যেন কেমন হয়ে গেলেন, কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরুল না। আমিবললুম—বোধহয় অত খেয়াল করে তুমি কখনো দ্যাখোনি, তাই ধরতে পারো নি—আমি কিন্তু বরাবর—

আমার স্ত্রী বিবর্ণমুখে বললেন—বলব একটা কথা ?আমার আজ মনে পড়ল—একটু চুপ করে থেকে বললেন—

—খোকা যখন মারা যায় আর বছর আষাঢ় মাসে, সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে তাকে ডাবের জল খাওয়াতুম।আমি নিজের হাতে কতবার খাইয়েচি। তুমি তো তখন বাইরে বাইরে ঘুরতে, তুমি জানো না।

আমার কোনো উত্তর খানিকক্ষণ না পেয়ে বললেন, জানতে তুমি এ কথাটা ?

—না জানতুম না অবিশ্যি।

কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে আর একটা কথা মনে তোলাপাড়াকরছিলুম—পেয়ালাটা আমাদের ছেড়েচে তো ?ওটাকে কেনতখন ভেঙে চুরমার করে নষ্ট করে দিইনি ?আবার কোনোউপায়ে এসে এ বাড়িতে ঢুকবে না তো ?